Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 215 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 215 - 224
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

লোকগানে নারী : প্রেক্ষিত পুরুলিয়া জেলা

বিপ্লব কুমার মাহাত
গবেষক, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: biplabmahato63@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, লোকগান, লোকজীবন, নারীজীবন, গার্হস্থ্যজীবন, আত্মপ্রতিকৃতি,

Abstract
সাহিত্য আবর্তিত হয় মূলত নারীকে কেন্দ্র করেই। প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে বলা যায় নারীর মূল্য কোনো দিনই উপেক্ষিত ছিল না। সমাজ সৃষ্টির প্রাক্ মুহূর্ত থেকেই নারীর অবদান সর্বত্র। গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, এমনকি যুক্তিগ্রাহ্য প্রবন্ধেও নারীর সমান কদর। কবিতা ও গানের মূল সমন্বয়ই যে প্রেম ভাবনা তা নারীর অবয়ব সম্পৃক্ত জীবন বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভরশীল। কবি যখন বলেন –

“প্রেমের বিষে জ্বরজ্বর জ্বালায় মরি অবিরত
উদগারিতে না পারি বিষ, না পারি গিলিতে।”

স্পষ্টতই এ গানে নারীর উচ্ছ্বসিত সচকিত পিয়াসী মনের জ্বরজ্বর প্রেমচেতনা প্রকাশিত। এ কথা ঠিক জ্যোতি ও প্রজ্ঞায় স্থির হলেও নারী লোকগানে তার সতত বিহ্বল চঞ্চল রূপই আমাদের আকৃষ্ট করে। পুরুলিয়ার লোকগান ঝুমুর, টুসু, ভাদু, জাওয়া, করম, পাতা প্রভৃতির মূল আকর্ষণ নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের লোকজীবনের ঘরের কথা স্পষ্ট করা, কিন্তু এই সমস্ত পুরুলিয়ার লোকজীবন সম্পৃক্ত গানগুলোর মধ্যে কোথাও বাদ পড়েনি নারীর জীবন কথা। লোকগানগুলির মূল বিষয় না হলেও মূল আশ্রয় আসলে নারীর জীবন ও প্রেম। কোনো কোনো গান আবার শুধুই নারী কেন্দ্রিক। কবি যখন বলেন ‘ঝিঙা ফুল ঝিঙা ফুল হলুদ বরণ কেনে/ পিরীতে মজিলে মন রঙ লাগে মনে।’ প্রকৃতির সৌন্দর্য বিশ্লেষণে তার লক্ষ্য অসমাপ্ত, আসলে তিনি নারী মনকে রাঙিয়ে তার উপর উচ্ছ্বসিত প্রেমের সংকেত উৎসারিত করতে চেয়েছেন। লোকগান গুলিতে কবি শুধু পুরুষের চোখে নারীকে দেখেননি, নারীর চোখেও পুরুষকে দেখার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। নারীর স্বগতোক্তি ‘মনের মতো রসিক পাল্যেই যাব বিন্দাবন লো’। লোকগান লোকসংস্কৃতির সম্পদ। পুরুলিয়ার লোকগানের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। গানগুলির অন্তরাগের মধ্যে যেমন বৈভব, প্রকৃতির সুমিষ্ট ফলের সুবাস তেমনি নারীর আমৃত্যু জীবন কথাও সংশ্লিষ্ট।

Discussion

লোকসংস্কৃতির একটি মূল উপাদান হল লোকসংগীত বা লোকগান। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মানুষের জীবনাবর্তের প্রাণ আসলে লোকগান। যদিও শুধু গানের ঐতিহ্যকে স্বীকার করে লোকগানের পূর্ণতা হয় না, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট গানের সমন্বিত নৃত্যও। পুরুলিয়ার মানুষের মুখ নিসৃত লোকগানগুলি মানুষকে শুধুই আকৃষ্ট করে না, এর সঙ্গে এখানকার মানুষ নিজের আত্ম-প্রতিকৃতিকেই অনুভব করে। গানের পরম্পরা ঐতিহ্যজাত। বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে অবসাদ মুক্তির তাগিদে গান চর্চা করে এসেছে। প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশ কাব্য কবিতা আসলে গানের মতো করেই উচ্চারিত হয়। সুর, লয়, তালেরও এক অপূর্ব সম্মেলন দেখা যায় তাতে। লোক গানগুলিও মানুষ নিজের প্রয়োজনেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে উচ্চারিত করেছে। পুরুলিয়া ও তৎ সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকায় লোক গানের চর্চা বহু প্রাচীন। পুরুলিয়ার মাটি ছৌ ঝুমুরের মাটি নামেও বিশেষভাবে পরিচিত। ঝুমুর, টুসু, ভাদু, পাতা, করম প্রভৃতি গানগুলি পুরুলিয়া তথা এ অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক পরিচয়কেই আরও অনেক বেশি স্পষ্ট করে। তবে এই গান গুলি শুধু পুরুলিয়া নয়, দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার যেমন আদরের সামগ্রী তেমনি সাহিত্য ইতিহাসেরও গবেষণার উপকরণ। নারীর জীবন কথা, নারীর প্রেম, নারী প্রেম, নারীর সামাজিক পরিচিতি, মনস্তত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব সমস্ত কিছুই মুহূর্মুহু ধ্বনিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন লোকগানে। তবে একথাও ঠিক যে পুরাতন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ ও ইতিহাস যেমন লোকগানগুলিতে প্রতিফলিত হয়, এগুলির মধ্যে নারীর নতুন জীবনবোধের চেতনাও বিম্বিত হয়।

পুরুলিয়ার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির ভান্ডারও কম নয়। ভাদু, টুসু, ঝুমুর, সহরই, বাঁদনা, জিহুড় ইত্যাদি আপন সংস্কৃতির টানেই পুরুলিয়ার মানুষ সারা বছর মেতে থাকে। বিশেষ করে ঝুমুর এখানকার মানুষের প্রাণ, সর্বত্র বৃক্ষসজ্জার মতো বৈচিত্র্য। তবে লোকগান ঝুমুর শুধু সীমায়িত ক্ষেত্রকে আঁকড়ে ধরে নেই অন্যান্য জেলাতেও ঝুমুরগানের জনপ্রিয়তা সল্প নয়। পুরুলিয়ার ঝুমুর স্বাদে ও সুরে যেমন সমৃদ্ধ, অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি থেকে স্বতন্ত্র। পুরুলিয়ার লোকগানগুলি আসলে এখানকার মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। নির্দিষ্ট সময় অন্তর লোক গুলির বিশেষ চর্চা হলেও এগুলি পুরুলিয়ার জনজাতির চিরায়ত ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই নতুন আকর্ষণ জুগিয়েছে। ঝুমুর, ভাদু, টুসু, সহরই বা অহিরা একটা নির্দিষ্ট জনজাতির সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে, বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণেই লোকগানগুলির বহুল প্রচলন। বিয়ে বাড়ি থেকে শুরু করে এখানকার মানুষের নিত্য অভ্যাসের মধ্যেই গানগুলির ব্যাপক প্রসার। সামাজিক বিভিন্ন নৃত্য উৎসবেও লোকগানগুলি মহত্ত্ব কম নয়।

লোকগানের পিঠ ভূমি বলা হয় পুরুলিয়াকে। রুখা মাটি আর শুখা ভুঁই -এ জেলার মূল পরিচিতি। জেলার ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদানও কম নয়। বিভিন্ন সময়, প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল থেকেই মানুষ ইতিহাস সম্পৃক্ত নানা জিনিস এখানে খুঁজে পেয়েছেন- ধর্মীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে প্রাচীন মানুষের তৈরি হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র। এগুলি ব্যবহারের প্রয়োজনেও সৃষ্টি হয়েছে লোক গান –

> "কুমার ঘরে পাবি গো ধূপদিয়া সরা
> বেন্যা ঘরে পাবি গো এক পুর্‍্যা সিন্দুর।"[1]

১৯৫৬ সালে জন্ম পুরুলিয়া জেলার। তৎকালীন বিহারের মানভূম জেলা বিভাজনের ফলেই জন্ম হয় পুরুলিয়ার। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্ভুক্ত এই জেলা 'ছৌএর মাটি' নামেই বেশি পরিচিত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পুরুলিয়ার অস্তিত্ব থাকলেও বরাবরই পুরুলিয়া জেলা খরা প্রবণ বলেই চিহ্নিত। লোকগানে তার কথা উঠে এসেছে -

> "তবে না আইল ভারি বরষা,
> সবাই হয়ে গেল নিরাশ হে
> হামদের না রুয়াইল কিনা ধানের চারা হে,
> দাদা ভাবটাই বুঝাছে ইটা খরা,
> রোদে মাটি ফাঁটে হঁইয়ে গেল গাড়া হে
> ও যে আধি ভরা ডবা ডাঁড়ি, হামদের খিল রহিল ছোটো ঘুটু বাড়ি

খেতের মাঝে চরে কত গরু কাঁড়া
ভাবটাই বুঝাছে ইটা খরা।"[২]

লোক গান পুরুলিয়ার মানুষের বরাবরই নিজস্ব পরিচিতি বহন করে।

পুরুলিয়ায় ঝুমুর গানের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। এখানে ঝুমুর শুধু গান নয়, তার সুর ও তালের সঙ্গে নাচের রীতিও বহু প্রাচীন। পূর্বে নাচের ক্ষেত্রে পুরুষদেরই অংশগ্রহণ থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে মেয়েরাও সমান ভাবে এ গানে নেচে থাকে। শুধু আধুনিক যুগজীবনের জ্বলন্ত ছবিই যে এ গানের মূল অবলম্বন তা নয় বহু প্রাচীন, পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে লোকগান ঝুমুর। যেমন রামায়ণের চরিত্র বিষয় উঠে এসেছে এ গানে -

"চৌদ্দ বছর যাবো বনে মাগো তুমি কাঁদো কেনে নিশ্চয় বিধি করিবে বিচার।
মা তুমি কাঁদো না গো আর, চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলে ফিরে আসিব আবার।।
লক্ষ্মণ যাইবে সঙ্গে বাকল পরিব অঙ্গে, বনের ফলে মূল করিব আহার।
সূর্য বংশে রবে নাম অরণ্যে করিব ধাম, বনের পশু পক্ষি সঙ হবে আমার।।
মা তুমি কেঁদো না গো আর চোদ্দ বছর পূর্ণ হলে ফিরে আসিব আবার।
বিমাতারও দোষ নাই, ভাগ্যে লেখা ছিল তাই ঘটিল মা কপালে আমার।।
মা তুমি কাঁদো না গো আর, চোদ্দ বছর পূর্ণ হলে ফিরে আসিব আবার।"[৩]

প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পৃক্ত এ লোকগান ঝুমুরে সমাজিক সম্পর্ককে সুষ্ঠু ভাবে দেখানো হয়েছে। মা ও সন্তানের চিরন্তন স্নেহ সিঞ্চিত সম্পর্কের বীজটি যেমন উন্মোচিত হয়েছে, মায়ের অবুঝ মন কেঁদে উঠেছে বারবার, সন্তানের ফিরে আসার সান্ত্বনা বাক্যও মায়ের মনকে তৃপ্ত করতে পারেনি। এখানে রামের বনবাস যাত্রা থেকেও নারী হৃদয়ের দোলাচলতায় যেন অধিক মাত্রায় প্রকাশিত। আবার মহাভারতের বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা অন্য একটি লোকগান ঝুমুরে আছে –

"অর্জুন : কৃষ্ণ অর্জুন দুই জন রথে করে আরোহন, উপমিত সমর মাঝারে
হেরিয়া ফাল্গুনী কই শুন প্রভু দয়াময়, মোদের এছার রাজ্যের নাহি প্রয়োজন হে,
শুন সখা শ্রী মধুসূদন।
দ্রোণ গুরু অশ্বত্থমা, কৃপাচার্য শৈল মামা, পিতামহ গঙ্গারই নন্দন।
আর না করিব রণ আমরা ফিরে যাবো বন, আমরা অনাথা হইব পঞ্চজন হে।
শুন সখা শ্রী মধুসূদন।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণ শতেক ভ্রাতা দুর্যোধন, তাদের কেমনে করিব বিনাশন।
... শ্রীকৃষ্ণ বলিছেন বাণী শুন সখা ফাল্গুনী সখা বলি হে তোমারে,
সপ্তরথী করে যেদিন অভিকে মরায় এই ভাব সেদিন ছিলো বা কোথায়।"[৪]

এ প্রাচীন লোকগানে হয়তো নারীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই কিন্তু নারীর সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্তেই কৃষ্ণের এই সত্য উন্মোচন। পৌরাণিক বিষয় কেন্দ্রীক লোকগানগুলিতে নারীর অবাদ বিচরণ ও নারী শিক্ষার বীজ নিহিত। এগুলো ছাড়াও আবার অন্য একটি ঝুমুর গানে অপেক্ষারত রমণীর হৃদয় উন্মোচনের কথা সাবলীল ভাবে স্পষ্ট হয়েছে -

"বধুঁ আসব্যে বলে কপাট না দিলাম ঘরে
বধুঁ হে এত রাত কেনে
পথের মাঝে কি বা হল্য জানব্য কেমনে।"[৫]

আপন মানুষের আসার বিলম্ব দেখে আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় আজ মেয়েটি চঞ্চলা। বিষাদে সমাচ্ছন্ন তার মন। আবার কাছে পেয়ে পরক্ষণেই তার বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস -

"সিকি লয় আধুলি লয় মনের গিরাই বাঁধ্যে রাখব্য
কাছে পাল্যম ইবার আমি মনের কথা বলব্য।"[৬]

এ গানে আত্মহারা মেয়েটি নিজেকে সঁপে দিয়েছে প্রিয় মানুষটির কাছে। নারীর প্রেম অনুভুতির কথা ঝুমুর গানের অন্যতম অবলম্বন। কখনো নারী পুরুষকে প্রেম নিবেদন করেছে আবার কখনো পুরুষ নারীর প্রেমে টানে দিশেহারা। গভীর প্রেমের অনুভূতিটাকে কবি ব্যক্ত করেছেন -

"অগাধ সলীল তুমি আমি তাহে মীন গো
মনে রেখো আমি তোমারি অধীন গো।
কি বলিব আমি তুমি নিশিদিন গো
মনে রেখ কভু না ভাবিও ভিন গো।"[৭]

ঝুমুরে নারীর সুখের কথা যেমন স্পষ্ট তেমনি আবার আক্ষেপের কথাও উপেক্ষিত হয়নি -

"ভালয় ছিলি আগে হরি আর কেনে হল্য মন চুরি
উয়ার লাগ্যে আমার রাতেও নাই থল কুল গো।"[৮]

লোকগান ঝুমুর নারীর প্রেম যৌবনের গান। দেখা যায় প্রেম বিহ্বলা নারী তার কল্পিত পুরুষকে উদ্দেশ্য করে গেয়ে ওঠে–

"আমি হে রজনী গন্ধা, গন্ধ বিলাবল সারা সন্ধ্যা
মধুছন্দা আমি তুমার প্রিয়, ভালোবাসা নিও।"[৯]

নারীর মন সতত অচঞ্চল, স্থির তার প্রজ্ঞা। তাই প্রেমরসে সিক্ত মিলন পিয়াসী নারীর উচ্ছ্বসিত মনের কথা লিখতে গিয়ে কবি গেয়েছেন -

"প্রেমের বিষে জ্বরজ্বর জ্বালায় মরি অবিরত
উদ্গারিতে না পারি বিষ, না পারি গিলিতে।"[১০]

শুধু নারীর প্রেম নয়, তার জীবন সংসারের গৃহস্থালির কথাও লোকগান ঝুমুরে সমান ভাবে ফুঁটে উঠেছে। রুখা মাটির জেলা পুরুলিয়া। বছরের নির্দিষ্ট সময় সাময়িক বৃষ্টি হলেও তা এখানকার মানুষের পর্যাপ্ত নয়। বৃষ্টিহীনতা যেন এ জেলার পরিচিতি। ভূ-প্রকৃতি সমতল নয়। উচু নিচু পাথুরে মাটির ভূখণ্ড বলেই চাষের পক্ষেও এখানকার মাটি অনুপযুক্ত। আসলে এই প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম করে এখানকার মানুষ বেঁচে আছে। মানুষের দুঃখ বেদনার কথা লোকগানে স্পষ্ট হয়েছে। মূলত গ্রাম বেষ্টিত জেলা পুরুলিয়া। সাঁওতাল, কোল, ভিল,কুর্মি, শবর, বীরহড়, সর্দার প্রভৃতি আদিম জনগোষ্ঠীর বাস এ জেলায়। এখান কার গ্রাম, জাতি এমনকি মানুষের নামকরণের মধ্যেও লোকগানগুলির পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে-

"... সিঁদরি, চিড়কা গোলবেড়া, বেলকুড়ি কুকুরগড়্যা
পুরুল্যার নিকট আছে রাঘবপুর মাগুড়্যা।

জাতির নামের ক্ষেত্রেও ঝুমুরের সুর –

"... কুলহু ডম, ভাট ভাটুয়ারা জাইতের মধ্যে তাঁতি ..."[১১]

শত দুঃখে পুরুলিয়ার মানুষ জর্জরিত। পরিবারের অভাবের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি বলেছেন –

"একদিনকার হলুদবাটা তিনদিনকার বাসি লো
বড় সুখে আছি আমি সবকে বলে দিবি লো।"[১২]

অর্থাৎ সামন্য টুকু হলুদ নিয়ে তাকে তিন দিন চালাতে হয়। অভাব সঙ্কীর্ণ পরিবারে মেয়ের গতর ঝরে পড়েছে, তাই আক্ষেপ ধরা পরেছে তার মনে। কবি গেয়েছেন –

"ছুটু মনি ডিহালি কেনে গো তুই বিহালি
জনহাইর ঘাঁটা খাঁয়ে লো তুই কেনে এত শুখালি।"[১৩]

রুখা শুখা পুরুলিয়ার মানুষের ক্ষেত্রে লোকগান ঝুমুর যুগযুগ ধরে সমাজ সংসারের চেতনা, ও সেই নারীর প্রেম আশ্লিষ্ট জীবন কথা, তার দুঃখ, স্বপ্ন-বিষাদের অনুরণিত হয়েছে সুমিষ্ট সুরে। নারীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছে লোকগান ঝুমুর। কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন –

"নারী পুরুষ সবাই বল   লিখব পড়িব চল
সরকার খুলেছে স্কুল গো
বই খাতা কলম লিব   দাদু নাতি সঙ্গে যাব
আর না করিব মোরা ভুল গো।"

...

'ত্রি জগতে করে পুজা

দেখ, অকালে পূজে রঘুবর গো।।"[১৪]

এ গানে দেবী বিশ্ববন্দিতা, রহস্যময়ী, মহিমামন্ডিত। নারী দেবী কালীর বর্ণনার সঙ্গে নিজের আবেগকে মিশিয়ে দিয়েছেন কবি গানে। কবির দৃষ্টিতে দেবী কালী বিশ্বরূপা, সমগ্র বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী। তিনিই আবার হতাশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ মোচনের সারথি। কবি গেয়েছেন -

"গলে দলে মুণ্ডমালা, করি ত্রিভুবন আলা
মাগো ও মা কালী -
কারে মা তুঞ জীবন কাঁদালি পরেশ করে কৃতাঞ্জলি,
নাই দোয়াত কালি,
মাগো মা ও মা কালী
মা গো অন্তিম কালে দিও পদধুলি।"[১৫]

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকগান হল ঝুমুর। আঞ্চলিক লোকগান গুলির একটি ঝুমুর। সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনায় ঝুমুরের চর্চা নদীর স্রোতের মতোই প্রবহমান। অঞ্চল বিশেষে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আদিবাসী সম্প্রদায় মূলতঃ কুড়মি জাতির জীবন চর্চার ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এ গানের মধ্যে, বলা যায় ঝুমুর আসলে কুড়মি সম্প্রদায়ের জীবন বৈচিত্র্য ও ভাবধারার চিহ্ন বাহক। সুতরাং ঝুমুরের চর্চা হল একটি জনজাতির মনন ও চিন্তনের অন্দরমহলকে স্পর্শ করা। লোকসংস্কৃতির বাহক বলেই এর আবেদন বহুমুখী। প্রাচীনকাল থেকেই নানা ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়ে এর নব নব রূপ গড়ে উঠেছে। এমনকি সময়ের প্রেক্ষাপটে এর রূপ ও গঠনের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা গেছে। তথাপি কোথাও এর মূল্য বিকৃত হয়নি। আজও ঝুমুর শাশ্বতকালের লোকসাহিত্য হিসেবে চর্চিত ও পঠিত হয়ে আসছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সমান তাল মিলিয়ে নিত্যনতুন ঝুমুর সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। সীমান্তবাংলার সাহিত্য হিসেবেই শুধু নয়, বাঙালি সমাজের সামগ্রিক চিন্তা চেতনার অন্তরঙ্গে ছড়িয়ে গেছে চোরাবালির মতো। বহুমুখীনতার সূচনা ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীর বহু আগে থেকে।

ঝুমুর - লোকায়ত গানের শ্রেষ্ঠ পরশমণি। কান্না-হাসির দোল দোলানো নিত্যদিনের জীবনকথা যেন ঝুমুর গানে বারম্বার একটা জায়গা দখল করে রেখেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে ঝুমুরের ধারা চলে আসছে। মূলত ঝুমুর গানে নাচ, গান ও বাজনার এক অপূর্ব সম্মেলন প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীন ওমধ্যযুগের এই প্রমাণ গুলোই স্পষ্ট করে যে ঝুমুর হাল আমলের সৃষ্টি নয়। জনপ্রিয় এই লোকসংগীতের বীজ রোপিত হয়েছিল বহু আগে থেকেই।

অনান্য গানে সুরের যে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে ঝুমুর ক্ষেত্রেও সেই ধারায় দেখা যায় যদিও এগুলির প্রয়োগ খুব একটা অন্যান্য গানে দেখা যায় না। তবে কিছু সুরের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। সুরের বাঁধনেই ঝুমুর চিরায়ত ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার চিত্তচঞ্চলতার যে ছবি কবি বলেন সেই ছবি আমরা ঝুমুর গানেও প্রত্যক্ষ করি। ভবপ্রীতানন্দ ওঝার একটি গানে আছে –

"শুনিয়া সঘনে মুরলিতাল, চমকে চমকে উঠয়ে প্রাণ
চরণ যাইছে টলিয়া
ভাবি শ্যাম তনু, দহিছে অতনু
তনু যায় যেন জ্বালিয়া।।"রং[১৬]

অন্য একটি গানে তিনি রাধার অভিসারের যাত্রা বর্ণনা করেছেন এভাবে –

"যমুনা তটে নিকুঞ্জ বিকশিত যথা প্রসূন পুঞ্জ
গুঞ্জরে অলি অলি মাতিয়া।
সেথায় মুরারী বাজায় বাঁশরী
রাধা রাধা নাম ধরিয়া।
রং।। চলে যায় গো রাধা, চলিল রাধা দামিনী গতি জিনিয়া।।"[১৭]
(চঞ্চল চিত অঞ্চল পড়ে খসিয়া)

আসলে গানগুলির বিষয় বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধা কৃষ্ণ হলেও ঝুমুর তার ধারাটা অক্ষত রেখে নতুন রঙ-এ রাঙ্গায়িত হয়ে আকৃষ্ট করেছে সমান ভাবে। বিভিন্ন সময় বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সুপন্ডিত কবি মহাজন পদের অনুসরণে বহু ঝুমুর গান রচিত হয়েছে। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, কুড়মালি ও অন্যান্য ভাষাতেও রচিত হয়েছে তাঁর বহু গান। মূলত রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলি আধুনিক মনস্ক মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। "শারদ পূর্ণিমা নিশি পূর্বাসায় পূর্ণ শশি/ নিজে হাসে হাসায় অবনি"[১৮] - রাধা-কৃষ্ণ প্রেম অন্বয় আশ্লিষ্ট হলেও গানের শাশ্বত সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য লোকায়ত জীবনকে স্পর্শ করে। অভিনব সুর মূর্ছনার জন্যই আদরনীয়ও বটে।

প্রাচীন লোকসঙ্গীতগুলির একটি ঝুমুর। মূলত মানভূমের মানুষের জীবন চলচিত্রের প্রত্যেকটি পরতে পরতে চল রয়েছে ঝুমুর গানের। প্রাচীন উৎসবাদী ও আচার-আচরনের মধ্যেও ঝুমুর গান বিশেষ ভাবে গাওয়া হয়। অনেক সময় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের অনেক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে ঝুমুর। রাধার অভিসার, রাগ, অনুরাগ, মাথুর ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে ঝুমুর গানে। তবে মানভূমের প্রচলিত ঝুমুরই আসলে আমাদের মাতিয়ে রাখে, যদিও একই সঙ্গে জাগিয়ে তোলে সমাজের অভিশপ্ত পণপ্রথা ও তার বিভৎসতার দিকটিও।

লোকগানগুলির মধ্যে আর একটি অন্যতম লোকগান করম গীত। মূলত একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে গানগুলো গাওয়া হয়। যা করম পরব নামে পুরুলিয়ায় খ্যাত। এখানকার মানুষ বিশেষ করে মাহাত, কুর্মি, ভূমিজ মানুষজনের এ গান নিজস্ব। তাদের বিশ্বাস ও আচার আচরণীর মধ্যে এ গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগানে মেয়েদের অবাধ প্রবেশ। ভাই বোন উভয়রই সুখ সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এ গান চর্চা বেশি হয়। করম উৎসবের সময় অবিবাহিত ও বিবাহিত প্রত্যক মেয়েরায় তাদের বাপের বাড়িতে আসে এবং করম ঠাকুরের পুজা করে। বিবাহিত নারীর কণ্ঠে গীত হয়েছে -

"না আইল কাকা মোর না আইল বাপ,
চলি চলি আইল মোর পিঠকর ভাই।"[১৯]

এ উৎসব পালনের ক্ষেত্রে মেয়ে উৎসবের অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। নদী বা পার্শ্ববর্তী কোনো জোড় বা জুড়িয়া থেকে বালি এনে তাতে মুগ, কলাই ইত্যাদি ছড়িয়ে দেয়। কিছু দিনের মধ্যে তা পং বেরিয়ে যায়, যাকে করম ডালা বলে। এই করম ডালা নিয়ে তারা নাচ করে করম গীতের তালে তালে -

"হাত ধরো না গো প্রিয়
শক্ত করে মুঠি
ভেঙ্গে যাবে আমার হাতের রূপোর কাঁকন দুটি।
নাই'বা করলে সোহাগ তুমি
জড়িয়ে ধরে গলা,
ছিঁড়ে যাবে আমার সাধের
রূপোর মটর মালা।"[২০]

গানের মধ্যে তাদের মনের সাধারণ ভাবনায় প্রকাশিত।

করম গানে মেয়েরা জমে থাকা দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা-কামনা, দুঃখ, জীবনের কথা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গান গেয়ে ও নেচে নেচে ব্যক্ত করে। গানের মধ্যে ভাই ও বোনের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহ মিশ্রিত মিলনের আনন্দ প্রকাশ পায়-

"বহিন - কিয়া খাওয়াইলে ভাইরে কিয়া পিন্ধাওলেরে
কিনা দেয়েরে দাদা করলে বিদায়।
ভাই - ভাত খাওয়াইলম্ বহিন, লুগ্গা পিন্ধালম্ গো
ডালা দেয়ে গো বহিন করলাম বিদায়।"[২১]

স্পষ্টতই গানের মধ্যে নারীর মনন সহনশীলতার সুষ্ঠু প্রকাশ দেখা যায়। তাদের নিজস্ব কথোপকথন সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত, সম্পর্কও সুদৃঢ়, বোনের সরল জিজ্ঞাসায় ভাইয়ের স্নেহ মিশ্রিত উত্তর নারীর মর্যাদাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। করম পরবে শুধু মেয়েদেরই উপস্থিতি বেশি। অবিবাহিত মেয়েদের এক্ষেত্রে আবার অবাধ স্বাধীনতা। গানে গানেই মেয়েরা পিতা মাতার প্রতি অনুযোগ জানায় –

"... ডাল থাকতে ডগায় ফল ধরে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 215 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাবা গো বাবা উদরা দেশ থাকতে বিদেশ বিহা দেল।"[২২]

বিদেশ বিভুইয়ে থাকা মেয়ের বাপের বাড়িতে আশার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিবাহিত মেয়েদের শাশুড়ি ও স্বামীর বাধা অতিক্রম করে বাপের বাড়িতে আসায় দুরূহ। মেয়ে তাই স্বামীর কাছে মিনতি করেছে -

"ওঠো ওঠো ওঠো পরভূ ঝাড়ি বাঁধল কেশ গো
কহি দিয়া গো পরভূ হামর বিদায়।"[২৩]

গানে শুধু স্বামীর প্রতি অনুযোগ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ, দেওয়রের আচার ব্যবহারের কথাও স্পষ্ট হয়েছে গানে। শাশুড়ির প্রতি অভিযোগ জানিয়ে স্বামীকে অনুযোগ করে –

"সারাদিন সারারাইত গুড়ি কুটলম গো
তবু হুনা, দেল গটল পিঠা গো
... শুন সঁহয়া তহর মায়ের গুণ গো।"[২৪]

যাইহোক করম গানের মুল ভিত্তি হল নারী মনের দোলাচলতা এবং সেই সঙ্গে উৎসব কেন্দ্রিক উচ্ছ্বাস।

টুসু গানে নারীর অবাধ প্রবেশ। এ গানে নারী কখনো দীপ্তকণ্ঠে নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও এ গানে সতঃস্ফুর্ত ভাবে ফুঁটে উঠেছে। কোনো কোনো গানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ছবিও প্রকাশ পেয়েছে –

"এক মার সইলাম দুই মাইর সইলাম
তিন মারে আর সইব না
সাখী থাক ছোটো দেওর
তর ভাইয়ের ঘর কইরব না।"[২৫]

অনেক সময় নারী সংসার জীবনের যন্ত্রণা ও পরম্পরাগত যাতাকলের থেকে নিজেকে মুক্তির অনুসন্ধান করে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রার ক্ষোভ প্রকাশ করে। গৃহবধূ অকপটে বলে –

"কাশী যাব পৈরাগ খাব।
আর যাব বিন্দাবন।।
বিন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের হেইরবো গো যুগলমিলন।।"[২৬]

টুসু গানগুলিতে নারীর বাল্য বিবাহের বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়নি। সল্পবয়স মেয়ে বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি। এক্ষেত্রে দুঃখে মেয়েটি নিজের জীবনকেই শেষ করে দিতে প্রস্তুত –

"বরং তালগাছে টাঙ্গাই হব
বুঢ়ার সঁগে সাঁগা নাই হব।"[২৭]

দেখা গেছে এ অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব গান এ টুসু গান। গানগুলোর মধ্যে নারীর জীবন বৈচিত্র্যের অপার বিস্তার। অধিকাংশ গানগুলি নারীজীবন কেন্দ্রীক। উল্লেখ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলোর সঙ্গে নারীর সংসার জীবন ও ব্যক্তিজীবন যেন গানগুলিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

উল্লিখিত গানগুলির মতোই ভাদু গান সীমান্ত বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম একটি পরিচিত গান। উৎসব কেন্দ্রীক এ গানের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমানিত না হলেও এর নিজস্ব একটা ইতিহাস রয়েছে। নানা ধরনের লোককথা, জনশ্রুতি এ গান ও উৎসবের ক্ষেত্রে অলোচিত হয়েছে। ভাদুর প্রকৃত স্বরূপ কেমন, এ নিয়েই নানা মত দেখা গেছে। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনিটি হল কাশীপুর পঞ্চকোটরাজ নীলমণি সিংদেও এর কন্যা ভদ্রাবতী। তাকে কেন্দ্র করেই এ উৎসবের প্রচলন এ কাহিনি অধিক প্রচারিত। সমগ্র গান ও উৎসবের মধ্যে নারী কেন্দ্রীক অবহটায় চর্চিত। রাজকন্যা ভদ্রাবতী কুমারী মেয়ে, অবিবাহিতা। তাই এ গান মূলত অবিবাহিতা নারীর আত্মউন্মোচনের দলিল। নির্দিষ্ট সময়ে এ উৎসব, গান ও নাচের আসরটি পালিত হয়। ভাদ্র মাস থেকে শুরু করে এক মাস অবধি চলে, সংক্রান্তির দিন ভাদুর বিসর্জন অর্থাৎ ভাদু পরব। আগের রাতটা 'জাগরণ রাত'। সারারাতব্যাপি গানের মাধ্যমে চলে ভাদু'র আরাধনা। উপাসকদের কাছে ভাদু কখনো দেবী, কখনো মা, কখনো আবার ঘরের কন্যা বা মেয়ে হয়ে ওঠে। মূলত মেয়েদের কাছে এ জাগরণের রাত ভীষণ ব্যস্ততার রাত। সমগ্র চেতনা দিয়ে সাজিয়ে তোলে ভাদুকে। প্রত্যেক গ্রাম, পাড়ায় পাড়ায় চলে জাগরণ রাতে ভাদু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 215 - 224
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেবী, মাতা, কন্যার গান। তবে সেই সঙ্গে নারীর মনে হতাশাও দেখা দেখা গেছে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে ভাদু লৌকিক দেবী রূপে পূজিত হয়েছে। মানভূমের মেয়ের সন্তান কামনায় তার পূজা করেছে। গানে তার কথা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে –

"যদি কোলে আসে যাদু, আইস্ ছে বছর আইনবঅ ভাদু।"[২৮]

এক মাস ব্যাপি এ উৎসবে মেয়েরায় মূলত অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন গানের মধ্যদিয়ে দেবী ভাদুর আরাধনা করে। বাড়ির নির্দিষ্ট স্থানে ভাদু'র পিঁড়ি স্থাপন করে তাতে মৃন্ময়ী মূর্তি বসিয়ে তাকে মনের মতো করে পুষ্প মালা দিয়ে সাঁজিয়ে তোলে। গানে সেই আরাধনার কথা ফুঁটে ওঠেছে এভাবে -

"সাম্ দিলাম সলতা দিলাম সগ্ গে দিলাম বাতি গো।
সব ঠাকুর সন্ধ্যা লাও মা লক্ষী সরস্বতী গো।।
সব সংগতি পরানগতি সন্ধ্যা দাও গো ভাদুর কাছে।
শঙ্খ বাজাও ঘন্টা বাজাও ঘরে ভাদু ধন আছে।।"[২৯]

প্রকৃতির নিয়মেই ভাদু দেবীর বিসর্জন আসন্ন হলে মেয়েরা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বিসর্জনের যাত্রাকালে বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর মেয়েরা আবেগরুদ্ধ হয়ে গেয়ে ওঠে -

"যাছঅ যাছঅ যাছঅ ভাদু ক্ষণেক দাঁড়াও আইঙনাতে।
সম্ বছরের মনের কথা বইলব তোমার সাক্ষাতে।"[৩০]

লোক উৎসব গুলির প্রধান আকর্ষণই আসলে নাচ ও গান। লোকমনের আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলিই ধরা থাকে লোক গানে। স্বাভাবিকভাবে ভাদু গান ব্যতিক্রম নয়। ভাদু গানগুলি এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক গার্হস্থজীবনের দলিল হয়ে উঠেছে। ভাদুকে কেন্দ্র করে অবিবাহিত উপাসক কুমারী মেয়েদের জীবন কথা তাদের হাসি-কান্না, দুঃখ সুখ, আশা নিরাশার কথা সহজেই স্পষ্ট হয়েছে সাবলীল ভাবে। তাই তো ভাদু গানে মাধুর্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন–

> "কুমারী হৃদয়ের আশা - আকাঙ্খাই যে এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ভাদুর নামে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।"[৩১]

যাইহোক ভাদুকে নিয়ে পন্ডিতদের মনে তর্ক অমিমাংসিত থাকলেও লোকসাহিত্যের আঙিনায় গানগুলি অমূল্য সম্পদ। গানগুলি যেন কিশোরী মেয়েদের হৃদয় উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে চিরায়ত হয়েছে।

লোকগানের পরম্পরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। লোকসংগীতগুলি মূলত উৎসবকে কেন্দ্র করে গাওয়া হলেও এগুলি অনেক সময় মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও চর্চা করে থাকে। শুধুমাত্র ঝুমুর, টুসু, ভাদু নয়, পাতা নাচের গান, অহিরা গীত, ছৌনাচের গান এমনকি শিবের গাজনকে কেন্দ্র করেও গীত গানগুলি নারীর জীবন বৈচিত্র্যকে স্পর্শ করে গেছে। অহিরা গানের মধ্যে বাড়ির ঠাকুমা ও দিদি মাকে নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে রঙ্গ- রসিকতাও দেখা গেছে। আবার কোথাও গানের মধ্যে বন্দনা করা হয়েছে দেবী মাতার –

"বলে অহিরে
জাগো মা লক্ষী
জাগো ভগবতী রে বাবুহো
জাগে লেকা অমাবস্যার রাত
জাগে কা প্র'তিফল
দেবে মা লছমী
পাঁচ পুতায় দশ ধেনুগায়।"[৩২]

স্বাভাবিকভাবে লোকগানে নারীর অবারিত, অবাধ আনাগোনা। কখনো নারী মানবী রূপে প্রতিষ্ঠিত আবার কখনো নারী প্রেয়সীর ভূমিকায়। তার জীবন যুদ্ধের সমস্ত লীলা বৈচিত্র্য নিয়েই যেন লোকগানগুলি অনেক বেশি সমৃদ্ধ। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বেদনা-উচ্ছ্বাস, আচার-সংস্কার প্রভৃতির কথা অকপটে স্বীকার করে লোকগানগুলি আরও বেশি পরিচিত, চর্চিত, এবং আলোচিত হয়েছে। নারীর অবয়ব রূপকে আঁকড়ে ধরেই লোকগানগুলি লোকায়ত জীবনকে স্পষ্ট করে চিরায়ত হয়েছে। সেইদিক থেকে লোকগান শাশ্বত কালের পরিচয়কে কোথাও অস্বীকার করেনি বরং তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পরতে পরতে।

Reference:

১. রায়, ড. সুভাষ, 'পুরুলিয়ার ঝুমুর : উৎস বিকাশ ও পরিণতি', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি, ২০১৮/এ, পৃ. ১১
২. তদেব, পৃ. ৯৫
৩. ক্ষেত্র সমীক্ষা : অধ্যাপক দীপক কুমার মাহাত, আরামবাক কলেজ, সংস্কৃত বিভাগ, বয়স - ৩২
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ৯৫
৬. তদেব, পৃ. ৯৫
৭. তদেব, পৃ. ৯৫
৮. তদেব, পৃ. ৯৫
৯. তদেব, পৃ. ৯৬
১০. তদেব, পৃ. ৯৬
১১. তদেব, পৃ. ৯৬
১২. তদেব, পৃ. ১০৬
১৩. তদেব, পৃ. ১০৭
১৪. তদেব, পৃ. ১১০
১৫. তদেব, পৃ. ১১১
১৬. তদেব, পৃ. ১১৬
১৭. তদেব, পৃ. ১৫৬
১৮. তদেব, পৃ. ১২
১৯. মাহাত, কিরীটি সম্পাদিত, 'ঝুমুর সমগ্র', অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ২০২০, পৃ. ১১৯
২০. সেন, শ্রমিক ও মাহাত কিরীটি সম্পাদিত, 'লোকভূমি মানভূম', বর্ণালী প্রকাশনী, এপ্রিল- ২০১৫, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৭৫
২১. তদেব, পৃ. ১৭৮
২২. তদেব, পৃ. ১৭৯
২৩. তদেব, পৃ. ১৮১
২৪. তদেব, পৃ. ১৮২
২৫. তদেব, পৃ. ১৮৪
২৬. খান, ইয়াসিন সম্পাদিত, 'জঙ্গলমহল : সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১২৫
২৭. তদেব, পৃ. ১২৬
২৮. তদেব, পৃ. ১২৬
২৯. মাহাত, ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র, 'মানভূম সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, দিপাবলী ২০১৬, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৬৪
৩০. তদেব, পৃ. ৬৪
৩১. তদেব, পৃ. ৬৫
৩২. পত্রিকা : আজকের যোধন, ষষ্ঠ সংখ্যা, কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪২৬, পৃ. ১৭৩

Bibliography:

সিং, শিবশঙ্কর, 'পুরুলিয়ার লোকমেলা', নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিসট্রিবিউটরস্, জানুয়ারী, ২০২১

বিশ্বাস, ড. সুজিত কুমার, 'রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতি', আনন্দ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, কলকাতা ৭০০০০৭

মাহাত, কিরীটি সম্পাদিত, 'ঝুমুর সমগ্র', অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০২০

রায়, ড. দয়াময়, 'অগ্নিভূমে এক অগ্নিবিহঙ্গ', মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর, ২০২১, পুরুলিয়া

ওয়েব পুঞ্জি :

https://www.rokomari.com
https://meta.m.wikimedia.org
https://www.boibazar.com>book
https://bn.quora.com
https://shodhganga.inflibnet.ac.in
https://www.kaliokalam.com
https://www.prothoma.com
https://bn.banglapedia.org
https://wikilovesfolklore.org
https://www.sachalayatan.com
https://srikrishnacollegelibrary.org.in

ব্যক্তিঋণ :

অধ্যাপক দীপক কুমার মাহাত'র কাছ থেকে মূল্যবান বক্তব্য গ্রহণ করেছি।